খোকন সোনা, বলি শোন----

জিয়াউল হক

২০০০ সাল। গালফ এয়ারে কুয়েত হতে বাহরাইন যাচ্ছিলাম। জানালার পাশেই সীটটি পড়েছে। একে একে যাত্রীরা তাদের পাসপোর্ট-টিকিট পূন:তলাশী শেষে বিমানের ভেতরে আসছেন,হোস্টেসদের দেখিয়ে দেয়া সীটে বসছেন। দেখতে দেখতে বিমানটি প্রায় ভরে গেল যাত্রীতে। আমার পাশে পচিশ ছাব্বিশ বৎসরের একজন শ্রীলংকান মহিলা বসলেন। তাদের চেহারা, পোশাক দেখেই সাধারনত চেনা যায় তাঁরা শ্রীলংকান। বিমানে আসন নেয়া থেকেই দেখছি কাঁদছেন আর রুমাল দিয়ে নিজের চোখ মুখছেন।

বিমান রানওয়েতে, মহিলা নি:শব্দে কেঁদেই যাচ্ছেন। একটু অবাকই হলাম, বাড়ী যাবার সময় কি কেউ কাঁদে?। মেয়েরা শ্বশুর বাড়ী যাবার সময় কাঁদে জানি, তাও জীবনে প্রথমবার অথবা প্রথম দু একবার। কিন্তু পুরো দস্তুর “ বউ ” হয়ে গেলে কাউকে কাঁদতে দেখিনি!। আমি ভেবে নিলাম যে, আমার পাশের শ্রীলংকান মহিলাকে তার মালিক বা নিয়োগকর্তা ইচ্ছার বিরুদ্ধেই কোন অপরাধের কারনে দেশে পাঠিয়ে দিচ্ছে, অনিশ্চিত ভবিষ্যতের কথা ভেবেই তিনি কাঁদছেন!। এটি মধ্যপ্রাচ্যে চাকুরিরত কোন শ্রমিকের জন্য খুবই চেনা জানা ঘটনা, প্রায়ই এরকম হচ্ছে!।

বিমানটা আকাশে উঠছে। কেবলমাত্র মাটি ছেড়েছে সে, উঠে যাচ্ছে উপরের দিকে দ্রুত!। আমি জানালা দিয়ে নিচের জগত দেখছি, দ্রুত ছোট হয়ে আসছে ঘর বাড়ীগুলো!। ঐতো ফরওয়ানিয়া, ঐ যে ওদিকে হাসাবিয়া-আব্বাসিয়া, বাংলাদেশীদের এলাকা বলে পরিচিত এলাকাদুটো!। হঠাৎ করেই টের পেলাম, আমার পাশ থেকে মহিলা একটুখানি হেলে আমারই দিকে ঝুঁকেছেন, জানালা পানে দেখার জন্য!। মনে হলো আমার গা’র সাথে মিশে যাচ্ছেন!। আমি বিব্রত হলাম, জানালার দিক থেকে মুখ সরিয়ে একটুখানি পেছনে হেলে বসার চেষ্টা করলাম, এখনতো সীটটাকে পেছনেও ঠেলে দেয়া যাবেনা, কারন বিমান এখনও উঠেই যাচ্ছে। অতএব সীটের সাথে লেপ্টে যেতে চাইলাম, নিজেকে পেছন দিকে ঠেলে দিয়ে!। জানালা খালি পেয়ে ভদ্রমহিলা সীট বেল্ট বাঁধাবস্থাতেই ঝুঁকেছেন জানালার পানে। খুব আগ্রহ নিয়ে দেখার চেষ্টা করছেন নীচের দিকে, নিচের কুয়েত শহর। কি দেখলেন তা জানিনা, হঠাৎ করেই আমার মুখের দিকে তাকিয়ে ব্যাকারন বিবর্জিত ভূল আরবীতে প্রশ্ন করলেন, “ হোয়েন হাদা দওরা আজম”? । আমি তার চোখের দিকে এই প্রথম তাকালাম। চোখদুটো রক্তজবার মত লাল টকটকে! ফুলে গেছে, কেঁদে কেঁদেই বোধ হয়!। বড় মায়া হলো। আবার জানালা দিয়ে নিচের মাটি পানে তাকালাম। বিমান তখন কুয়েত শহরের উপরেই, এখন সে ডানে একটা লম্বা বাঁক নেবে এবং সোজা ওড়া শুরু করবে। আমার বাঁ পার্শ্বে নিচে সাগর, আমরা সুয়েখ পোর্টকে ঠিক আমাদের বাম দিকে রেখে চলেছি। একটু

পেছনের দিকে চাইলাম, ঐতো পেছনে সেই বিরাট গোল চক্কর, " দওরা আজম "(বর্তমান নাম "ইউনাইটেড নেশন স্কয়ার ")। তাকে দেখাবার চেষ্টা করলাম, বললাম ঐতো ঐখানে!। ভদ্রমহিলা আরও একটু ঝুঁকলেন কিন্তু বিমান ততক্ষনে ডানে বাঁক নিতে শুরু করেছে। আমার দৃষ্টিসীমা থেকে তা সরে যাবার সাথে সাথেই তাঁরও নজরের বাইরে চলে গেল, এখন তা একেবারে আমাদের পেছন বরাবর, অতএব দেখতে পাবার প্রশ্নই ওঠেনা। ভদ্রমহিলা সিটে বসেই ছটফট করলেন্, বার বার রুমাল দিয়ে চোখ মুছলেন!। অবাকই হলাম। এরই মধ্যে বিমান বালা খাবার পরিবেশন করেছে, তিনি খাবার , এমনকি এক কাপ চা বা কফিও নিলেন না!। আমি খেয়ে নিয়ে সীটের সাথে হেলান দিয়ে চোখ বন্ধ করার চেষ্টা করছি, ঘুম আসছেনা, আসবেনা জানি, তবুও চোখ বন্ধ করে বসে আছি।

যথা সময়ে আমরা মানাম নামলাম। আমাকে এখানে কয়েক ঘন্টা কাটাতে হবে। আনুষ্ঠানিকতা সেরে বিরাট যাত্রী লাউঞ্জের এক কোনে বসলাম। ব্রিফকেস থেকে কাগজ বের করলাম। লিখব এখন। সময়টাকে কাজে লাগাই।

ঘন্টাখানেক কেটে গেছে। হঠাৎ খুব কাছে কারো উপস্থিতি টের পেলাম। চোখ তুলে দেখি বিমানের ভেতরে আমার পাশের সীটের সেই মহিলা!, সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন, কিছু বলবেন মনে হলো!। চোখাচুখি হতেই তিনি ভাঙ্গা ও ভূল আরবীতে আমাকে প্রশ্ন করলেন আমি দওরা আজমের পাশে " মুসতাশফা শু'উন " চিনি কিনা। আসলে তিনি যেটাকে হাঁসপাতাল বলছেন সেটা হলো কুয়েত সমাজ কল্যান মন্ত্রনালয়ের আওতাধীন একটি পুনর্বাসন কেন্দ্র । সেখানে জন্ম থেকেই বিকলাঙ্গ ছেলে মেয়েদের রাখা হয়। কেন্দ্রটি আরও একটা বিশেষ কাজের জন্য প্রবাসীদের অতি পরিচিত। কুয়েতের বাসা বাড়ী বা অন্য কোথাও কাজ করতে এসে অনেকেই বিবাহ বহির্ভূত যৌনতায় জড়িয়ে পড়ে। তাছাড়া কুয়েতী নিয়োগকর্তা বা তার বাড়ীর পুরুষ সন্তান বা ভাই ব্রাদার দের হাতেও অনেক প্রবাসী মহিলা, বিশেষ করে বাসার কাজের মেয়েরা নির্যাতিতা হয়। গর্ভবতি হয়ে পড়ে। অনেক ক্ষেত্রেই কুয়েতীরা আগেভাগেই " ম্যানেজ " করে নেয়। কিন্তু সমস্যা বাধে যখন সেরকমটি হয়ে ওঠেনা, প্রেগনেন্সীটা এ্যডভান্স স্টেজে চলে আসে, তখন সন্তান প্রসব হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করে এবং যেই না সন্তান প্রসব হলো ওমনি সন্তানটিকে " পথে কুড়িয়ে পাওয়া " হিসেবে ঐ সমাজকল্যান কেন্দ্রে রেখে আসে। সরকার তাদের ভরন পোষন, শিক্ষা দীক্ষা সব বহন করে।

যাহোক তাঁকে ঐ কেন্দ্রটির খোঁজ নিতে দেখে আমার কৌতুহল বাড়ল। বললাম," হ্যাঁ আমি চিনি এবং তার পাশেই আমার কর্মক্ষেত্র, মেন্টাল হাসপাতাল"। তিনি পাশের চেয়ারে বসলেন, আবারও প্রশ্ন করলেন, " তুমি কি ছুটিতে যাচ্ছ?" বললাম, "একটু জরুরী কাজে যাচ্ছি, দুই সপ্তাহ পরেই ফিরব "। ভদ্রমহিলা আমার একটি হাত ধরে ফেললেন, তার দু চোখ দিয়ে অঝোরে অশ্রু ঝরছে। সকাতর কন্ঠে বললেন, "তুমি কি আমার একটি উপকার করতে পার?" আমি হাতটি ছাড়িয়ে নিলাম, " বলো দেখি কি করতে হবে, সম্ভব হলে চেষ্টা করব।"

তার কথার সারমর্ম হলো, তাঁর নাম "চাম্পা"। বিয়ে হয়েছিল নিজ দেশেই, গৃহযুদ্ধে স্বামী, ভাই হারিয়ে সংসারের হাল ধরতে দুই বৎসর আগে কুয়েতে আসেন, কুয়েতীর বাসায় খাদ্দামা হিসেবে কাজ শুরু করেন। কুয়েতি প্রায় সারা বৎসরই আমেরিকা অথবা সুইজ্যারলেন্ডে পড়ে থাকেন স্বপরিবারে। তার বৃদ্ধ ও পঙ্গু বাবাকে দেখাশোনার জন্য খাদেম খাদ্দামা, বাবুর্চী, ড্রাইভার সব রেখেছেন। তারাই বাড়ীর হর্তা-কর্তা। মাঝে মধ্যে কুয়েতীর মিশরীয় কর্মচারি (স্থানীয় ভাঁষায় "মন্দুব" বলে) এসে তাদের খোঁজ খবর নেন, বেতন দিয়ে যান, বাজার ঘাট যা লাগে। এখানেই এক ভারতীয় ড্রাইভারের সাথে তার মন দেয়া নেয়া, বিয়ের আশ্বাস, শারীরিক সম্পর্ক পর্যন্ত গড়ায় এবং এক পর্যায়ে সে গর্ভবতী হয়ে পড়ে। মালিকের ভয়ে সে তার ভারতীয় প্রেমিক কে বার বার বলেছে একটা " ব্যবস্থা " করতে। প্রেমিক প্রবর মিশরীয় মন্দুবের সাথে পরামর্শ (!)করলে সে মালিকের সাথে কথা বলে তাদের বিবাহ দেবার ব্যবস্থা করবে, আশ্বাস দেয়। বিনিময়ে অবশ্য দেড়শত দিনার উভয়ের কাছ থেকে হাতিয়ে নেয়। তারই ভরসায় তাঁরা নিশ্চিন্তে প্রসবের অপেক্ষায় থাকলেন। হাঁসপাতালে যেতে পারেন নি পুলিশের ভয়ে। এরই মাঝে কুয়েতি এলেন, সব শুনেতো মহাখ্যাপা!। ভাবগতি বুঝে আগে ভাগেই সেই প্রেমিক প্রবর লা পাত্তা!। পুলিশের খাতায় পলাতক হিসেবে মালিক তাকে নথিভুক্ত করে রাখলেন। কিন্তু বিপদ হলো চাম্পা'র। পুলিশ ডেকে তাদের হাতে তুলে দিলেন। পুলিশ তাকে যেদিন নিয়ে গেল জেলখানায়, তার ঠিক চারদিনের মাথায় প্রসব বেদনা উঠল এবং যথারীতি হাসপাতালে নেয়া হলে একটি পুত্র সন্তান প্রসব করলেন। চাম্পা হাঁসপাতালে থাকতেই জ্বরে আক্রান্ত হলেন। একটানা আটদিন ভুগলেন, এই কদিন সন্তান তাঁর কাছেই ছিল। কিন্তু নবম দিনে সকালে দুই মহিলা এসে তাঁর কোল থেকে সন্তানকে নিয়ে গেল। তাঁর গলা ফাটানো কান্না, কেউ আমলেই নিল না!।

'ও যে পাপের ফসল!। কেউ একবারও ভাবলনা ওর কোন দোষ নেই! ঐ ছোট্ বাচ্চা কার কাছে থাকবে? থাকবেতো আয়াদের কাছে! যাদের সাথে তার কোন আত্বিক, মানসিক বা নাড়ীর সম্পর্ক নেই!!। ও কাঁদবে আর কাঁদবে, কেউকি একবারও তাকে আদর করে কোলে তুলে নেবে? কেউ কি একবারও তাকে আদর করে মাতৃদুগ্ধ পান করাবে? না, করাবে না। ওর কি দোষ? ও কেন এত কষ্ট ভোগ করবে? আমাকে আর কিছুদিন তার কাছে রাখলে কি অপরাধ হত? অথবা আমার সাথে তাকেও দিয়ে দিলেতো হতো, আমি তাকে নিয়ে যেতাম, খেয়ে না খেয়ে মানুষ করতাম!!। "

তাঁর কথা গুলো বার বার আটকে যাচ্ছিল উপচে পড়া কান্নায়!। বসে বসে কিছুক্ষন কাঁদলেন তিনি, তার পর আবারও রুমালে চোখ মুছে আমার দিকে তাকালেন, বললেন " তুমি না বললে যে, তুমি ঐ হাসপাতালের পাশেই মেন্টাল হাঁসপাতালে চাকুরি কর?" বললাম " হ্যাঁ"। তিনি যেন একটি সুত্র পেলেন, আরও একটু কাছে এগিয়ে বসলেন, আমার হাতের উপরে আলতো করে তাঁর হাত রাখতে গেলে আমি তা সরিয়ে নিলাম, "তুমি বলো আমি শুনছি।" "তুমি এমন কাউকে চেন না যে ঐখানে চাকুরি করে, তুমি কি তার সহযোগীতায় আমার ছেলেটাকে এক নজর দেখে আসতে পারবে না!"?। বললাম, "সেখানে অনেক

বাংলাদেশীই চাকুরি করেন, আমার এক বন্ধু-পত্নীও আছেন, কাজেই সেটা সমস্যা নয়, সমস্যা হলো তোমার ছেলেটাকে চিনিনা। মাত্র নয়দিনের বাচ্চা কি করে চিনব? এবং আমি তাকে দেখে আসলেইবা তোমার কি লাভ হবে ?। তিনি কিছু একটা ভাবলেন! , তাইতো, আমি দেখে আসলে তাঁর কি লাভ হবে? আবার বললেন, "তুমি একটা নজর দেখে এস, তুমি ইচ্ছা করলেই তাকে খুঁজে বের করতে পারবে, তুমি দেখলেও আমি বুঝব এমন একজন তাকে দেখেছে, যে জানে তার এই হতভাগী মা'র বুকে কত কান্না!, কত হাহাকার!!"। ততক্ষনে মাইকে ঘোষনা শুরু হয়েছে, কলম্বোগামী যাত্রীদের ডাকা হচ্ছে। তিনি উঠে দাঁড়িয়েও এগুলেন না, আমার দিকে তাকিয়েই থাকলেন। কিছু একটা বলতেই হয়, অন্তত একজন মা'কে সান্তনা দেবার জন্য হলেও!!। বললাম "আমি চেষ্টার করব আমার পরিচিত ভারতীয়-বাংলাদেশী কর্মচারিদের সাহায্যে খুঁজে বের করতে, তাদের বলব, তারা যেন তোমার ছেলের দেখা শোনা করে।" খুবই খুশি হলেন তিনি, নুয়ে পড়ে অপ্রস্তুত করে দিয়ে আমার একটি হাত তুলে তার উল্টো পিঠে চুমু খেলেন!!, বললেন " ইশ্বর তোমার ভালো করুক।" তাঁর দু চোখ দিয়ে ঝরছে অঝোর ধারায় অশ্রু!!। তিনি ঘুরে দাঁড়ালেন যাবার জন্য, কি ভেবে একটু দাঁড়ালেন, বললেন, " তুমি যদি কুয়েতে আরও অনেক দিন থাক, আর আমার ছেলেটা ততদিন যদি বেঁচে থাকে, বড় হয়, তা হলে তাকে আমার কথা বলো, বলো, সে যেন মানুষ হয়, বলো, মানুষ হতে পারলে তার কোন দু:খ থাকবে না!"। বলেই তিনি এগিয়ে গেলেন। আমি তাঁর গমন পথের দিকে চেয়ে থাকলাম। চেক ইন এর গেট দিয়ে ঢোকার আগে সেই দুর থেকেই তিনি আবারও চাইলেন, হাত নাড়তে দেখলাম তাঁকে, মাথাও নাড়ালেন, আমি শুনলাম না তিনি কি বলছেন, তবে বোধ হয় বুঝলাম! তিনি বলছেন "আমার ছেলেটাকে মানুষ হতে বলো, তাকে আমার কথাটা পৌছে দিও কেমন !"। অজান্তেই আমিও হাত নাড়লাম তাঁর উদ্দেশ্যে। কিন্তু আমার মন ,মননে তখন বেজে চলেছে সেই ছোটকালে শোনা বাংলা গানের চরন, " খোকন সোনা বলি শোন, থাকবে না আর দু:খ কোন, মানুষ যদি হতে পার!--" বোধ হয় এই বিশ্বের সকল মা'র মনের কথাই এটি!!।